গণতন্ত্রে ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ডঃ অরুণ কুমার গোস্বামী*

সারসংক্ষেপ ঃ ভৌগোলিক, ভাষাগত, নৃগোষ্ঠীগত, সংস্কৃতিগত ও প্রথাগত সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বাভাবিকভাবেই ঐকমত্য উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবে তা অনুপস্থিত। নিজের মতামতকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অপরের উপর তা চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা এবং অসহনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ঐকমত্যের অবস্থানকে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। আর তাই পর পর তিনটি সফল জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও ঐকমত্যের অভাবে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া হোচট খাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ঐকমত্য একটি সুদূর প্রসারী দ্যোতনা সৃষ্টিকারী উপাদান। ঐকমত্যের অভাবে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। কোন নির্দিষ্ট সমস্যার ব্যাপারে একটি দলের ব্যাখ্যা অপর দল থেকে ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি এবং দাম্ভিকতা বিভিন্নতার মাঝে ঐকমত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করে রাখে। রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সমস্যা এবং গণতন্ত্রের সংহতকরণ বিষয়ের গবেষকগণ ঐকমত্য সম্পর্কে তাঁদের স্ব স্ব ধারণা উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ঐকমত্যের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা এবং এর সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঐকমত্যের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারতের শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সুদীর্ঘকালব্যাপী ঐকমত্য থাকায় গণতন্ত্র সংহতকরণ প্রক্রিয়া স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করেছে। অথচ এর বিপরীতে বাংলাদেশে চলমান গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া ঐকমত্যের অভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পর্কে নির্বাচনে বিজয়ী এবং বিজিত দলের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে পরাজয় মেনে নিতে কোন দলই রাজী থাকে না। এভাবে প্রধান পরাজিত পক্ষ কর্তৃক স্বাভাবিকভাবে তাদের পরাজয়কে মেনে না নেয়া, জাতীয় সংসদ থেকে প্রধান বিরোধী পক্ষের দীর্ঘ মেয়াদী বয়কট এবং বিজীয় পক্ষ কর্তৃক দাম্ভিকতা প্রদর্শন ঐকমত্যের সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখে। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐকমত্যের ধারণা অনুযায়ী কোন অযৌক্তিক বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য হওয়া আকাঙ্ক্ষিত নয়। এ সব বিষয় যুক্তিসঙ্গত এবং যে সব মত "বাস্তব কারণসমূহের মুক্ত অনুশীলনের প্রাকৃতিক ফল" (The natural consequence of the free exercise of practical reasons) শুধুমাত্র সেগুলোকে পরস্পর কর্তৃক গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ঐকমত্য হতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ঐকমত্যের ধারণার প্রাসঙ্গিতা এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাবজনিত সমস্যা[1] বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম একটি

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজবাড়ি সরকারি কলেজ।
E-mail : drgoswami2003@yahoo.co.uk

প্রতিবন্ধকতা হিসাবে গণ্য করা হয়। ঐকমত্যের অভাবজনিত সমস্যা অন্য অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। অপরদিকে সমস্যার প্রকৃতিগত কারণে এবং অন্য অনেক সমস্যার মত ঐকমত্য এবং আস্থার অভাব দুটি সমস্যাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।[২] ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা[৩] তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ *Trust : The Social virtues and the creation of prosperity*-তে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মুক্ত বাজার, প্রতিযোগিতা এবং কঠোর পরিশ্রম সমৃদ্ধির একমাত্র অগ্রসূচক নয়। এক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান আছে তা হচ্ছে আস্থা। গণতন্ত্র ও সমৃদ্ধির গভীরতম ভিত্তি হলো আস্থা। পারস্পরিক আস্থাহীনতার কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এক ব্যতিক্রমী ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছে বলে ধরে নেয়া যায়।[৪] তবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দায়িত্ব পালনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সাংবিধানিক ভিত্তিও প্রশ্নের সম্মুখীন। পরপর তিনবার, ৫ম, ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন সব দলের আকাঙ্ক্ষিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বিজয়ী ও পরাজিত দলের নির্বাচনোত্তর আচরণ জনজীবনে স্বস্তির পরিবর্তে বিপুল সংশয় ও আতংকের সৃষ্টি করছে। সাধারণ নির্বাচনের কর্মকাণ্ড সমাপ্তির পর সংশয় আতংকের অবস্থা জাতীয় সংসদের স্বাভাবিক কার্যকালেও পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বিষয়ে হঠাৎ করে ঐকমত্য হয়েছে মনে হলেও তার স্থায়িত্ব খুবই স্বল্পকালীন। এভাবে ঐকমত্যের অভাব স্থায়িত্ব পাচেছ দীর্ঘকাল ব্যাপী। যদিও পরস্পরের মধ্যে মতভেদের বিষয়গুলো এবং জাতীয় মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করণের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদের ভিতরে এবং বাইরে 'সম্মতি এবং বিতর্ক (Consent and debate) পদ্ধতি অনুসরণে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে কিন্তু তা আজ নেই বললেই চলে। গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে জাতীয় সংসদকে গড়ে তোলা তথা জাতীয় সংসদকে শক্তিশালী করণের কোন বিকল্প না থাকা সত্ত্বেও সংসদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণে এ মনোভাবের প্রতিফলন হচ্ছে না।

গবেষণার অনুসিদ্ধান্ত (Hypothesis) : প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারতে আইন সভার সদস্যগণ "সম্মতি ও বিতর্ক" পদ্ধতি অনুশীলন করে এটিকে তাঁদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

অনুসরণের অভাব প্রতিফলিত হয় জাতীয় মৌলিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে জাতীয় সংসদে "সম্মতি ও বিতর্ক" পদ্ধতি অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার মধ্য দিয়ে। ফলে পরপর ৩টি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় মৌলিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে 'ঐকমত্য' পরিলক্ষিত হচ্ছে না। জাতীয় সংসদে জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হতে হলে তাই প্রথমেই রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের সদস্যদের আচরণ গণতন্ত্র সম্মত করে তুলতে হবে। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনে জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এই অনুসিদ্ধান্তটি (Hypothesis) প্রমাণের চেষ্টা করা হবে। সমস্যাটির গভীরতা সম্পর্কে বাংলাদেশের এবং বিদেশের গবেষক ও পর্যবেক্ষকদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ঐকমত্যের অভাব সম্পর্কে সচেতন মহল মাত্রেই উদ্বিগ্ন। ঐকমত্য না থাকা তথা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংঘাতমূলক অবস্থার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে উদ্ভূত আতঙ্কের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ঘন ঘন হরতাল, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি, জাতীয় সংসদে কোরাম সংকট এবং জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে লক্ষ্যগত দিকে একই মনোভাব সত্ত্বেও এসব ইস্যু সম্পর্কে ঐকমত্য প্রকাশে আগ্রহী না হওয়ার মধ্য দিয়ে। আর ঐকমত্য সম্পর্কে গবেষক ও পর্যবেক্ষকদের লিখিত বিভিন্ন নিবন্ধ, আলোচনাসভা, পত্রিকার পাঠকদের মতামত কলাম, দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ মহলের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে জাতীয় সংসদকে তাত্ত্বিক ভাবে মেনে নেয়া সত্ত্বেও ঐকমত্যের অভাবে জাতীয় সংসদের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয় এবং প্রকৃত পক্ষে তা একটি অকার্যকর আইন সভায় পরিণত হবার ফলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। ঐকমত্যের অভাবে, এ ছাড়াও, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়। ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তির কারণে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের যাত্রা শুরুর পর এমনকি প্রাক-নব্বই সময় কালের তুলনায় অধিক সংখ্যক হরতাল হয়েছে। পাশাপাশি একই সময়ে জাতীয় সংসদের বিরোধীদল দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং ঘন ঘন জাতীয় সংসদের অধিবেশন বয়কট করেছে। বাংলাদেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের বিপুল ত্যাগ তিতিক্ষা এবং ঐক্যবদ্ধতার ফলশ্রুতিতে নব্বই দশক থেকে শুরু হওয়া গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার মাঝে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার এমন নজির বিহীন অবস্থা গবেষণার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র বৈকি? আর তাই জাতীয়

বিষয়গুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের মধ্যে "ঐকমত্যের" অনুপস্থিতি গণতন্ত্রায়নে গবেষকদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলে।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ বর্তমান গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

১. ঐকমত্যের ধারণা অনুসন্ধান করা।

২. তুলনামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত অনুভূতির অনুসন্ধান করা।

৩. বাংলাদেশে চলমান গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় ঐকমত্যের অবস্থান ও সমস্যা অনুসন্ধান করা।

৪. ঐকমত্যের পথে উদ্ভুত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান অনুসন্ধান করা।

পটভূমিঃ ১৯৮৯ সালে The National Interest এর Summer সংখ্যায় লিখিত নিবন্ধে এবং পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা গ্রন্থ The End of History and the Last Man এ ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা[৫] প্রবলভাবে যুক্তি দেখান যে, বিগত বছরগুলো থেকে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈধতার ব্যাপারে সমস্ত বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য ঐকমত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামার দাবী অনুযায়ী মানব জাতির চূড়ান্ত মতবাদ হিসাবে "গণতন্ত্রকে" আখ্যায়িত করার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যেতে পারে তবে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক বহুপাক্ষিকতা স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৫-২০ বছর আগের তুলনায় আজকের পৃথিবী অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। অন্ততঃপক্ষে ১৪০ টির মতো দেশে মোটামুটি নিয়মিতভাবে বহুদল ভিত্তিক নির্বাচন ও হচ্ছে। গণতন্ত্রের এই অগ্রাভিযানে বাংলাদেশেও একজন সহযাত্রী। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এক ঐতিহাসিক যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইতিহাসে এ ঘটনা এক যুগান্তকারী "ঐকমত্যের" দলিল। যা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও পরিলক্ষিত হয়েনি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব বাংলাভাষী মানুষ স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। তবে এ সময় দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিভক্তি ও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তার এদেশীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর এদেশীয় সহযোগীরা বাঙ্গালী হয়েও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতার করার কারণে যে বিভক্তি হয়েছিল তা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসাবে যারা নিজেদেরকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল তাদের মধ্যকার বিভক্তি ছিল লক্ষ্যণীয়। এভাবে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের কর্ণধারদের মধ্যে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে কিন্তু ১৯৭০ এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেও বিজয়ী হতে পারেনি অথবা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি এমন রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী

সমর্থকদের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে; মুক্তিযদ্ধে সক্রিভাবে অংশগ্রহণ কারী যোদ্ধা যারা 'মুজিব বাহিনী' ও 'মুক্তিবাহিনীর' মধ্যে বিভক্ত ছিল তাদের মধ্যে; সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দলেল ছাত্র-যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মূলদলের নেতৃত্বের মধ্যে; চীন পন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে মুক্তি যোদ্ধাদের সাথে বিশেষতঃ মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে রাজনৈতিক বিভক্তি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এসব বিভক্তির মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় ছিল, তা হল স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিচ্ছিন্ন ভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা দলগুলোর চিন্তা ভাবনা বা কর্মকাণ্ড থাকলেও এ লক্ষ্য বাহ্যিক ভাবে "ঐকমত্যের" দলিল আকারে জন্ম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। পাশপাশি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোনো সর্বসম্মত, স্পষ্ট এবং প্রকাশিত রেকর্ড দেখা যায়নি। এই সব দিক বিবেচনায় ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তির লক্ষ্যে আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলসমূহের তিন জোটের যে, ঐতিহাসিক যৌথ ঘোষণা দেয়া হয় তা ঐকমত্যের এক অভূতপূর্ব উজ্জ্বল নিদর্শন।

আর এই যৌথ ঘোষণার মাধ্যমেই রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে তৎকালীন স্বৈরশাসক ক্ষমতা হস্তান্তর করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয। এই সংসদেই সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুমোদিত হয়। তাতেও ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায় ব্যাপকভাবে। রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান সম্বলিত দ্বাদশ সংশোধনী পরবর্তীকালে জনমত যাচাইয়েও উত্তীর্ণ হয়। গণতন্ত্রকে সংহতকরণ প্রচেষ্টায় এসব সফল উদাহরণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। কিন্তু এরপরে সফলভাবে ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় মৌলিক ইস্যু ও গণতান্ত্রিক আচরণ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবই এর জন্য দায়ী। অথচ আশা করা গিয়েছিল গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মত নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে এবং পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু করেছে সেহেতু এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে তারা সহনশীলতার পরিচয় দিবে। যার মধ্যে প্রতিফলিত হবে তাদের মধ্যে "ঐকমত্য"। এ প্রসঙ্গে Robert Putnam এর মন্ত ব্য প্রণিধান যোগ্য। Robert Putnam[৩] তাঁর Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy গ্রন্থে বলেছেন "Those who build new institutions and those who would evaluate them, need patience" (1993:60).

ঐকমত্যের ধারণা ঃ খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড্যানকোয়ার্ট রুস্টো[৭] তাঁর এক সুপরিচিত নিবন্ধে বলেছেন গণতন্ত্রে সামগ্রিকভাবে কিছু ঐকমত্য থাকতে হবে। যদিও এর বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে। পরবর্তী কালে ১৯৯৬ সালে তিনি তাঁর[৮] অপর এক নিবন্ধে বলেছেন গণতন্ত্রের জন্য একটি প্রাথমিক পূর্বশর্ত হচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য। দেশের নাগরিক তথা সমগ্র জনগণের চাওয়া না চাওয়া বিষয়গুলো সম্পর্কে দেশের ভিতরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক ধরনের সার্বিক ঐকমত্য ছাড়া গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব নয়। এই ঐকমত্যকে হতে হবে সচেতন ও ঐচ্ছিক নির্বাচনের ভিত্তিতে, বাইরে থেকে তা চাপিয়ে দিলে চলবে না। তারা কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবেন এ প্রশ্নে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে সন্দেহ শূন্য হতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য যে সংগ্রাম ও জাতীয় ঐকমত্যের শর্ত রুস্টো দিয়েছেন বাংলাদেশের বেলায় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। ১৯৭০ এর নির্বাচনে ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ সে প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত। কিন্তু স্বাধীনতার পর মুলতঃ পাকিস্তানের শাসক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামরিক শাসনের সাথে পরিচিতি এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনভিজ্ঞতা গণতন্ত্রের যাত্রাকে বাধাগ্রস্থ করেছে।

J.P. Nettl[৯] (১৯৬৭ ঃ ৩৩৪) এর মতে ঐকমত্য বলতে প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়ে সমাজের সদস্যদের মধ্যে একপ্রকার সমঝোতা বোঝায়, বোধগম্য ভাবে যা সর্বজন স্বীকৃত সাধারণ উপাদান সমূহের সমষ্টি এবং আধুনিক সমাজে সূক্ষ নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর আদিগন্ত নিয়মবদ্ধ করে। এ ছাড়াও এটি সচরাচর অতিরিক্ত বা স্বতঃস্ফূর্ত সমঝোতার ধারনা বহন করে। আর গণতান্ত্রিক বিশ্লেষকগণ একদলীয় বা জাতীয় ভাবে সৃষ্ট কম্যুনিস্ট বা ফ্যাসিবাদী সমাজের আরোপিত বা অনায়াসী বিরোধিতা করেছেন। কম্যুনিস্ট বা ফ্যাসিবাদী সমাজে ঐকমত্য অনেকটা রাজনৈতিক ভাবে আরোপিত আর গণতন্ত্রে ঐকমত্য স্বেচ্ছাপ্রসূত (সামাজিক)। ঐকমত্য মানসিক অবস্থার সমষ্টিগত বিষয় যা উৎপন্ন ও কার্যকর হয় সামাজিক অবস্থার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থার দ্বারা।

ঐকমত্যের অস্তিত্বের যুক্তি আদর্শিক রাজনীতির পশ্চাদপসরণ এবং বিভিন্ন ধারণাগত সংঘাত এর অগ্রগতির সঙ্গতিপূর্ণ মীমাংসা অথবা আপসের উপর স্থিত। এ ক্ষেত্রে আদর্শিক রাজনীতি বলতে বুঝায় সার্বভৌমত্ব এবং এর মুল্যবোধ সৃষ্টি ও বৈধতার দানের জন্য সংঘাত প্রক্রিয়া হিসাবে। ঐকমত্যের তত্ত্ব অনুযায়ী শাস্তি প্রদান বিষয়টি প্রান্তিক যা কেবলমাত্র সামাজিক শৃঙ্খলা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

বেরী হোল্ডেন[১০] মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ঐকমত্যকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ইল্টার ট্যুরান[১১] ঐকমত্যকে রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচনা করতে চেয়েছেন। আর রাজনৈতিক সম্প্রদায় বলতে

তিনি সেই জনগোষ্ঠীকেই বুঝাতে চেয়েছেন যারা অনুভব এবং/অথবা একমত পোষণ করেন যে তাদের একই সম্প্রদায়ের অধীনে বসবাস করা উচিত।

Robert Putnam[১২] তাঁর গ্রন্থে "নাগরিক সম্প্রদায়" (Civic Community) সৃষ্টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন যা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তিনি "নাগরিক মানবতাবাদ" (Civic Humanism) এর ধারার সাথে যুক্ত করেছেন। আর এই নাগরিক মানবতাবাদের চারটি সূচক তিনি দিয়েছেন। এ সূচকগুলো হচ্ছে (১) নাগরিকদের সংশ্লিষ্টতা (Civic Engagement) (২) রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality) (৩) সংহতি, আস্থা এবং সহনশীলতা (Solidarity, Trust and tolerance) (৪) সহযোগিতার সামাজিক কাঠামোসমূহ (The Social Structures of coperation) এ ছাড়াও তিনি অপেক্ষাকৃত গৌন একটি বিষয়কে সুচক হিসাবে ধরেছেন তা হল ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে ভোটারদের ব্যক্তিগত পছন্দ। পাটনামের এই সূচকগুলোর মধ্যে "সংহতি, আস্থা ও সহনশীলতার" মধ্যে ঐকমত্য সরাসরি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে সন্দেহের কোন ও অবকাশ নেই যে গণতন্ত্র ক্রিয়াশীল থাকতে হলে "নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে" সংহতি, আস্থা ও সহনশীলতা থাকতে হবে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক বেশিষ্ট্য ও তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ঐকমত্য এর স্থায়িত্ব নির্দেশ করে। এ ক্ষেত্রে যদি কোনরূপ মতানৈক্য থাকে তবে তা রাজনেতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। কোরিয়ান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বং-সিক কীম[১৩] এর মতে Political institutions reflect culture, that is the dominant values, convictions, attitudes and customs of the people. Culture also infuses institutions, provides their dynamism and affects their informal relationship and processes. বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিভক্তির সংস্কৃতি এ দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে আমরা ১৯৯০ এর গণতন্ত্রায়নের যাত্রা শুরু পর জাতীয় সংসদের কার্যক্রমে বিদ্যমান অসহনশীল ও মৌলিক বিষয়ে মতানৈক্যের বিষয়টি সমীক্ষার অন্তর্ভূক্ত করতে পারি।

জন রল্স[১৪] এর ন্যায় বিচার (Justice) তত্ত্বে ঐকমত্যের ধারণা একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমরিটাস প্রফেসর জন রলস তাঁর সাম্প্রতিক মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ "The domain of the political and overlapping consensus" এ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আধুনিক বহুত্ববাদী গণতন্ত্রসমূহ একটি সাধারণ আনুগত্যের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তিনি যাকে বলেছেন "Overlapping consensus" বাংলায় যাকে আমরা বলতে পারি আচ্ছাদিত ঐকমত্য। রলস এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যগণ কিছু মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা তাদের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে বজায় থাকবে বলে ঐকমত্য পোষণ করতে পারেন। প্রত্যেক সদস্য এই

ঐকমত্যের বিষয়বস্তু সঠিক বলে গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক সদস্যের ব্যাপক ভিত্তিক মতামত ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত না হলেও তাদের স্ব স্ব বিশ্বাসের ব্যাত্যয় না ঘটিয়ে এই ঐকমত্যের বিষয়বস্তু সব পক্ষ গ্রহণ করতে পারেন। তবে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অর্থাৎ ঐকমত্যের এই ব্যাখ্যা দ্বারা কি এটা বোঝানো হয় যে, আচ্ছাদিত ঐকমত্য হচ্ছে রাজনৈতিক বিতর্ক এবং আপোষ মীমাংসা দ্বারা অর্জিত, এক ধরনের পদ্ধতি যা সদস্যদের কাছে অগ্রহণযোগ্য নৈতিক মূল্যবোধ পোষণকারীদের সাথে শুধু ঐক্য গড়ে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকবে এবং যদি তাই হয় তা হলে ঐকমত্য শুধুমাত্র রাজনীতির ফসলে রূপান্তরিত হয়, যা পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয় এবং অনেকের কাছে গ্রহণীয় ন্যায়বিচার (Justice) এর সাথে তা সম্পর্কহীন হতে পারে? আচ্ছাদিত ঐকমত্য সম্পর্কে উপরোল্লিখিত নিবন্ধে এই ধরনের ন্যায় বিচার নীতির দ্বারা গঠিত বলে দাবী করা যায়। বিশেষতঃ তিনি যুক্তি দেখান যে ঐকমত্য অনুধাবন করতে হবে নীতি ও মুল্যবোধের একটি যুক্তিসঙ্গত কাঠামো বিবেচনা করতে যা, উপযুক্ত শুধু তাই ধারণ করার ক্ষেত্রে যেগুলো "মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে" প্রযোজ্য এবং যা এগুলোর সাথে বিরোধাত্মক বিষয়গুলোক অতিক্রম করে। সেহেতু এটা এমন ঐকমত্য নয় যা মতামত নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক সদস্য অনুমোদন করতে পারে। জন রলসের ধারণা অনুযায়ী ঐকমত্য হচ্ছে বাস্তব কারণসমূহের মুক্ত অনুশীলনের ফসল। এই পর্যায়ে জন রলস আশা করেন বহুত্ববাদী সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে এবং থাকতে পারে বল প্রয়োগের নীতির পরিবর্তে শুধুমাত্র সহনশীল উপায় ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে তিনি ন্যায় বিচারের গণ চরিত্র দাবী করার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ থাকার সহনশীল উপায় ব্যবহারের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। রলস সফল হলে ন্যায় বিচারের ধারণার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে এক থাকতে পারে তার তাৎপর্যপুর্ণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হবেন বলে ধরে নেয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে রলস "বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য" (Unity in diversity) সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা উপস্থাপন করেছেন বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তাঁর এই ধারণা বহুত্ববাদী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে।

উপরে আলোচনা থেকে আমরা ঐকমত্যের গভীর ধারণা পেতে পারি যা আমাদের বর্তমান নিবন্ধের পরবর্তী স্তরে যেতে সাহায্য করবে। ঐকমত্যের ধারণার মুলপ্রতিপাদ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

১. ঐকমত্য হচ্ছে রাজনেতিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সর্বজন স্বীকৃত উপাদান সম্পর্কে সাদৃশ্যপূর্ণ সমঝোতা।
২. রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রধানতম উপাদান হচ্ছে ঐকমত্য।
৩. ফ্যাসিবাদী ও কম্যুনিষ্ট ব্যবস্থার বিপরীতে গণতন্ত্রের ঐকমত্য হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত, সচেতন ও ঐচ্ছিক নির্বাচনের ভিত্তিতে, বাইরে থেকে তা চাপিয়ে দিলে চলবে না।

৪. গণতন্ত্রে ঐকমত্য বাস্তব কারণ সমূহের মুক্ত অনুশীলনের ফলশ্রুতি। সহিংসতামূলক সংঘাতের পরিবর্তে "সম্মতি ও বিতর্কের" মধ্য দিয়ে যা অর্জিত হতে পারে। বহুত্ববাদী সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে এবং থাকতে পারে বল প্রয়োগের নীতির পরিবর্তে শুধুমাত্র সহনশীল নীতি ব্যবহার করে। যা বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে।

৫. সংহতি, আস্থা ও সহনশীলতা ঐকমত্য সৃষ্টির প্রধান উপায়।

বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঐকমত্য ঃ কর্তৃত্ববাদী বা সর্বাত্মকবাদী ধরনের যে কোন একনায়কতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'ঐকমত্য' একটি আরোপিত বিষয়। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঐকমত্য একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিষয় যা বাস্তব কারণসমূহের মুক্ত অনুশীলনের ফলশ্রুতি। বাস্তব কারণসমূহ সম্পত্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদা (Property, Power and Prestige) প্রভৃতির অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও অনুভূতি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল এক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা প্রকাশের অধিকার সর্বজন স্বীকৃত। মতামত প্রকাশের এই ব্যবস্থা মুক্ত অনুশীলনের ভিত্তি। মুল অনুশীলন হতে পারে প্রিন্টিং ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, রাজপথের মিছিল মিটিংয়ে, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে এবং আইন সভার কার্যক্রমের মাধ্যমে। তবে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইন সভার মধ্যে মুক্ত অনুশীলন প্রতিফলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মুক্ত অনুশীলনের প্রতি সহনশীল মনোভাব তথা রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা 'ঐকমত্য' কে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। "সম্মতি ও বিতর্ক" এর গণতন্ত্র সম্মত পদ্ধতি অনুসরণে অভ্যস্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ নিশ্চিতভাবেই আইন সভার অভ্যন্তরেও একই পথ অনুসরণ করে থাকেন।

বিশ্বের স্বীকৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেমন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাপানে[১৫] দীর্ঘকাল যাবৎ Liberal Democratic Party (LDP) নির্বাচনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় আসছে। সে দেশে National Diet এর উচ্চ ও নিম্ন কক্ষে LDP প্রতিবারই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ট বিরোধী দল এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ট LDP কে কোনও বিলের ভাষা ও বিষয়বস্তুর বিষয়ে আলোচনা ও সমঝোতায় আসতে বাধ্য করতে পারে। এভাবে জাতীয় স্বার্থে আইন প্রণয়নে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান National Diet কে প্রকৃত পক্ষেই সর্বোচ্চ স্থান দেয়ার কারণে 'ঐকমত্য' অবশ্যম্ভাবীরূপে উদ্ভাসিত হয়। জাপানের মত একটি প্রাধান্য বিস্তারকারী দলীয় ব্যবস্থার (Predominant party system) ন্যায় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মোটামুটি পালাবদলীয় ব্যবস্থায় (Alternating System) সরকারী দল ও বিরোধী দলের ঐকমত্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

যুক্তরাজ্যে সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার নিয়মিত হাত বদল "মর্যাদাসম্পন্ন" সত্যতা হিসাবে স্বীকৃত। এই মডেল এমন একটি পদ্ধতি যাতে ফলপ্রসূ প্রতিনিধিত্ব সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দেয় এবং এভাবে বিভিন্নতাকে একই সূত্রে বেঁধে রাখে। এই পদ্ধতিতে যে দল বর্তমানে ক্ষমতার বাইরে তার সমর্থকগণ প্রকৃত পক্ষে আশা করতে পারে যে অতি নিকট ভবিষ্যতে তাদের দল ক্ষমতায় আসবে, আর সে কারণেই তারা সংসদীয় সড়ক (Parliamentary Road) অনুসরণে অনীহ নয়। এ বিষয়ে আরও যুক্তি হল যে, নির্বাচনে পরাজয় শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতা নয় এটি বাস্তব। এই বাস্তবতা ক্ষমতাসীনদলকে সব সময় সতর্ক অবস্থায় রাখে। এই সতর্কতার কারণে সরকার সম্ভাব্য অযোগ্য বা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত আর সর্বদা সচেষ্ট থাকে সততা ও ফলপ্রসূতা বজায় রাখতে। A.H. Birch (1964)[১৬] মতে এভাবে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার নিশ্চিত করার সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করা যায়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ৫৪ বছরের স্বাধীন ভারতের ৩৭ বছর অতিবাহিত হয়েছে কংগ্রেস দলীয় নির্বাচিত সরকারের দ্বারা। রিচার্ড সিশন (১৯৯৪)[১৭] ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রায়ন সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন স্বাধীন ভারতের শাসক দল কংগ্রেস দলীয় এলিটগণ 'মুক্ত রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার' নীতিকে কি ভাবে সম্মান করেছেন। নেহেরুর সময়ে (১৯৪৭-১৯৬৪) বিরোধী দলের সাথে পারস্পরিক বিনিময়ের একটি আবহ তৈরি হয়। এ রাজনৈতিক বাস্তবতায় কংগ্রেস একটি ব্যাপক ঐকমত্য ভিত্তিকদল এবং বিরোধী দল 'চাপসৃষ্টিকারী দলের' মতো কাজ করেছে। জাতীয় যে কোন মৌলিক ইস্যুতে বিরোধী দলের মতামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের চরম মুল্য দিয়ে (১৯৭৪ সালে) একবার ভারতীয় জাতীয় সংগ্রেস পরাজয় বরণ করেছিল। তবে পরবর্তী কালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী পরাজয় বরণ করেন। ফলে গণতন্ত্রের স্বার্থে বিরোধী দল ও সরকারী দলের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার পূর্বেকার ধারা অব্যাহত থাকে। তবে সব মিলিয়ে বিরোধী দলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ঐতিহ্য গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় জাতীয় মৌলিক ইস্যুগুলো সম্পর্কে ঐকমত্য বজায় থাকা ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বিশেষতঃ পরাজিত হলেই সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল কোন দল কর্তৃক প্রত্যাখ্যান না করার প্রবণতা, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক কোন সমস্যা তথা জাতীয় দুর্যোগের মুহূর্তে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রবল ঐকমত্য লক্ষ্য করা যায়।

দুই দলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্বাভাবিক 'রদবদলের' সুষ্ঠু কার্যক্রমের স্বার্থে এটিকে 'কেন্দ্রাভিমুখী' হতে হয়, অর্থাৎ প্রধান দুই দলকে নির্বাচক মন্ডলীর মনোভাবের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। অন্য ভাষায় বলতে হয় দুই দলকেই 'মধ্যপন্থা' অবলম্বন করতে হয় যা যে কোনভাবেই

এই দুই দলের নিজেদের প্রধান মুলধারার আদর্শিক অবস্থানের মাঝামাঝি। রাজনৈতিক দলগুলোর এইরূপ মনোভাব তাদের মিতাচার বা পরিমিতি বোধের পরিচায়ক। নির্বাচকমন্ডলীর বেশিরভাগ এইরূপ মনোভাব সম্পন্ন। তারা বাস্তববোধ সম্পন্ন এবং দলীয় আদর্শের অন্ধ অনুসারী নয়। আর যেহেতু নির্বাচনে বিজয়ের চাবিকাঠি তাদের হাতে সেহেতু প্রতিটি দলের কর্মীরা যেমনটি পছন্দ করে তার বিপরীতে 'দলীয়' সরকার নিজ দলীয় আদর্শের প্রতি কম অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই ধরনের মিতাচার রাজনৈতিক দলগুলোকে বাড়াবাড়ি আচরণ থেকে বিরত রেখে ঐকমত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে যা আবার ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টোটল[১৮] মিতাচারকে অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিরোধক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ দলের ভিতরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করায় অভ্যস্ত হলে এ ধরনের মিতাচার তাদের কাছ থেকে আশা করা যায়।

রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেয়ে ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে দলের প্রতি না ভোটারদের মনোভাবের প্রতি অনুগত হয়ে কাজ করতে হবে? তবে ন্যায় বিচারের স্বার্থে ভোটারদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই স্বাভাবিক। ভোটারদের মনোভাবের প্রতি প্রবল আনুগত্য দলীয় কর্মী সমর্থকদের মনোভাব থেকে কিছুটা বিচ্যুতি হতে পারে। অপরপক্ষে নির্বাচক মন্ডলীর রায়ের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধের কারণে জয় পরাজয় সব দলই মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। জয় পরাজয় মেনে নেয়ার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা লক্ষ্য করা যায় অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি পরাজিত ও বিজয়ী উভয় দলের প্রার্থীর মনোভাবের মধ্যে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল। এই ঘটনায় এদেশের অনেকে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের সহনীয় অনিয়মের সাথে উন্নত গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে অনেক মিল খুঁজে পেয়েছেন। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী আল গোর রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জুনিয়ল বুশের চেয়ে অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি জনপ্রিয় ভোটে এগিয়ে ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সে দেশের সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। কথিত রিপাবলিকান দল কর্তৃক নিয়োগকৃত সুপ্রীম কোর্টের ৫ জন ডানপন্থী বিচারক ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের জনপ্রিয় ভোট গণনা বন্ধ করে দিয়ে জুনিয়র বুশকে নির্বাচনে বিজয়ী বলে রায় দেয়। আদালতের এই রায়কে পরাজিত এবং বিজয়ী উভয়েই মেনে নেয়। এ ব্যাপারে আলবার্ট গোর কর্তৃক প্রদত্ত ছাড় দেয়া বিবৃতি এবং বিজয়ের পর জর্জবুশ[১৯] এর বক্তৃতা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আলবার্ট গোর বলেন, "এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমি তীব্রভাবে আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করার সাথে সাথে তা গ্রহণ করি। আমি এই চূড়ান্ত ফলাফল গ্রহণ করি যা পরবর্তী সোমবার ইলেকটোরাল কলেজ কর্তৃক সমর্থিত হবে এবং আজ রাতে আমাদের জনগণের ঐক্যের এবং আমাদের গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও শক্তির স্বার্থে, আমি আমার ছাড় প্রদান করছি। আমি জানি আমার অনেক সমর্থকই অসন্তুষ্ট[১৮]। আমিও অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমাদের অসন্তোষ দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসার দ্বারা জয় করতে হবে।"

বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করলে বলতে হয় সুপ্রীম কোর্টের রায় মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে আল গোরের কোন কারণ ছিল না। তাঁর পক্ষে ইলেকটোরাল কলেজের গঠন মেনে নেয়ার কোন ও কারণ ছিল না। আর এ কারণে জর্জ ডব্লিউ বুশের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেয়ার ও কোন কারণ ছিল না। বাংলাদেশের কোন রাজনীতিক কখনও তা করতেন না।

অপরদিকে জর্জ ডব্লিউ বুশের বিবৃতি এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। বুশ বলেন,

"আমাদের জাতিকে অবশ্যই একটি বিভক্ত পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। রাজনৈতিক ভিন্ন মতের চেয়ে একই আশা এবং লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ আমেরিকানদের নিকট অনেক মূল্যবান। আমাদের জাতির জন্য রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট উভয়েই কিছু আশা করে। আমাদের ভোট বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু আশা বিভক্ত হবার নয়...। সাধারন জ্ঞান, সাধারণ সৌজন্যবোধ এবং সাধারণ লক্ষ্য সম্বলিত মনোভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়ে এক সাথে আমরা একত্রিত হতে পারি এবং আমেরিকার নাগরিকদের উৎসাহিত করতে পারি। আমার এ বিশ্বাস আছে যে ঈশ্বরের সাহায্য নিয়ে আমরা একটি জাতি হিসাবে অবিভাজ্য থেকে একত্রে সামনে এগিয়ে যেতে পারি।' দেশের স্বার্থে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থীর এমন মনোভাব বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপস্থিত না থাকার বিষয়টি কৌতূহল সৃষ্টি করে বৈকি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতাঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারি, একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠন করা যেখানে সদস্যগণ ন্যায় বিচারের সাথে তাদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ভোগ করবেন। অন্যান্য কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি ছিল দেশের অধিবাসীদের ভাষাগত সাদৃশ্য। ভাষাগত ঐক্য ছাড়াও ভৌগোলিক, নৃ-তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত সাদৃশ্যও বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র গেঁথে রেখেছে। এভাবে একটি Homogenous সমাজে প্রকৃতিগতভাবেই ঐকমত্য বজায় থাকা স্বাভাবিক। একটি বহুত্ববাদী সমাজে ঐকমত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার আহ্বান বাংলাদেশের এই বাহ্যিক সাদৃশ্যপূর্ণ সমাজে পুরোপুরি প্রযোজ্য নাও হতে পারে। বিশ্লেষকগণ যুক্তি দেখান

যে, প্রধানতঃ বেশিরভাগ বাংলাভাষীদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বাংলাদেশের অধিবাসীদের সমপ্রকৃতির (Homogenous) বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে খুব কমই। বর্তমানে বেশকিছু সংখ্যক সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তিসমূহ ব্যাপকভাবে বিভক্ত এবং দেশের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন ঐকমত্য নেই বললেই চলে। কিন্তু এই বিভক্তি প্রয়োজনীয় ঐকমত্য সহযোগে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক হতে পারে। ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, ১৯৯১ ইং সালের ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী আইন সভায় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুমোদন এবং তারও পরে জনমত যাচাইয়ে এই সংশোধনী অনুমোদন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যদিয়ে বিভিন্নতার মাঝেও জাতীয় ঐকমত্য প্রদর্শিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের অনেক খ্যাতনামা গবেষক উপরোল্লিখিত বিষয় ছাড়াও কিছু বিষয়ে রাজনীতিকদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন ঐকমত্য লক্ষ্য করেছেন। এ গুলো হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীণ সমাজ তান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে ব্যক্তি মালিকানার প্রাধান্য সম্পন্ন মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে যাত্রার বিষয়ে দেশের দুই প্রধান দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একই পথ অবলম্বন করেছে, যা কে এক ধরনের ঐকমত্য হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। এই দুই দলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতিধারাও এক। এসব ঐকমত্য দেশের দুই প্রধান দলের যুগের সাতে তাল মিলিয়ে চলার প্রচেষ্টার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন যাকে বেগবান করেছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যাকে আরও বাস্তব করে তুলেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশের বর্তমানে শতকরা পনেরো জনের মধ্যবিত্ত, নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্ত। সাধারণ হিসাবে কোটিপতি বা ধনপতির সংখ্যা শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। অপর দিকে শতকরা ৬৭ জনের কোন জায়গা জমি নেই এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও আশংকাজনকভাবে বেশি। দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলো নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। অথচ বিশ্ব ব্যাংকের প্ররোচনায় প্রণীত দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র (PRSP)র ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য নেই।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্তে এরশাদ কর্তৃক গৃহীত উপজেলা ব্যবস্থা ১৯৯১-১৯৯৬ সালের সরকার কর্তৃক বাতিল হওয়াকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ঐকমত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গণ্য করেন। কিন্তু এ ধরনের ঐকমত্য দলীয় স্বার্থ চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রচেষ্টা বিশেষ। কারণ হিসাবে বলা যায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ উভয় দলই তাদের স্ব-স্ব নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে সন্নিবেশিত করেছে। সে হিসেবে উপজেলা ব্যবস্থা তারা টিকিয়ে

রাখবে এটাই ছিল বাস্তব। অপর দিকে এমনকি উপজেলা বাতিলের পর পুনরায় উপজেলা ও গ্রাম সরকার সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ বিএনপি ও আওয়ামী লগিের এ ব্যবস্থা তথা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিশ্রুতি পূরণের পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা যায়।

ঐকমত্যের সংকীর্ণ গন্ডীর মুক্ত অনুশীলনের একটি উদাহরণ পাওয়া যায় জাতীয় সংসদের সদস্যদের Tax free গাড়ী ক্রয়ের সুযোগ, তাদের ভাতা (Allowance) বৃদ্ধির প্রস্তাব, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল থেকে তাদের সাশ্রয়ী মূল্যে কাঠ ক্রয়ের পারমিট প্রভৃতি বিষয়ে। এসবই দলমত নির্বিশেষে সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিস্বার্থ চেতনার বহিঃ প্রকাশ।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে এমন ধরনের ঐকমত্য মানব জাতি সম্পর্কে হবসের ধারণা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেক মানুষ অপরের প্রয়োজনের চাইতে তার নিজস্ব প্রয়োজন সম্পর্কেই গভীরভাবে আগ্রহী। সংসদ সদস্যদের এ ধরনের স্বার্থপরতার অনুভূতির (Selfish Passions) পাশাপাশি প্রকৃতিগত অসামাজিক বা সমাজ বিরোধী অনুভূতি যেমন ঘৃণা, ক্রোধ এবং পরশ্রীকাতরতাও তাদের মধ্যে আছে। তবে এগুলো শক্তিশালী হলেও স্বার্থপর অনুভূতির চেয়ে স্বল্পস্থায়ী। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মীথ এর তথাকথিত বাজারের "অদৃশ্য হাত" সম্পর্কীয় তত্ত্বে ও এ বিষয়টির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে স্মীথ শুধুমাত্র এটুকুতেই সীমিত থাকেন নি তিনি হবসের বিরোধিতা করেন এরিস্টেটলের পক্ষে সমর্থন যুগিয়েছেন। তার মতে মানুষের স্বার্থপর অনুভূতি ছাড়াও সামাজিক অনুভূতি (Social passion) যেমন কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা (benevolence) আছে। তবে হবস থেকে স্মীথের বড় মাত্রার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর নৈতিক মনোবৃত্তি সম্পর্কীয় ধারণায়। এটি স্বার্থপরতা নিয়ন্ত্রণে সামাজিক নিয়ম সৃষ্টি, স্বার্থপরতাকে প্রতিহত এবং স্বাভাবিক কল্যাণকারীতা শক্তিশালী করে, আর এভাবেই ঐকমত্য ভিত্তিক সামাজিক জীবনকে সম্ভব করে তোলে। পুঁজিবাদের প্রবক্তা (Adam Smith) মানুষকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখেননি, তিনি মানুষের মধ্যে যেমন "মুনাফা মুখীনতা" লক্ষ্য করেছেন আবার এই মানুষকে বিশ্ব নাগরিক, প্রকৃতির বিশাল সাধারণ সম্পদ রাজির সদস্য হিসাবে দেখে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, মানুষকে সব সময়ই তার ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুদ্র অংশ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য তথা রাজনীতিকদের মধ্যে স্বার্থত্যাগী এবং স্বার্থপর উভয় মনোভাব বাহ্যিক ভাবে দৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে স্বার্থপর অনুভূতিই তাদের মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। এই সব পরস্পর বিরোধী গুণে গুণান্বিত সংসদ সদস্য তথা রাজনীতিকদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান দুটি দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া অন্যান্য যে সব ইস্যুতে অমিল তথা শত্রুতামূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যে সব বিষয়ে অনেকাংশে মিল লক্ষ্য করা যায় সে গুলো নীচে উল্লেখ করা হল।

সারণী– ১

বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে অমিল ও পরস্পরকে আক্রমণের প্রধান ইস্যুসমূহ

আওয়ামী লীগ	বিএনপি
বাঙালি জাতীয়তাবাদ	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ
ধর্ম নিরপেক্ষতার দাবীদার	নির্দিষ্ট ধর্মীয় মূল্যবোধকে দলীয় ভিত্তি বলে দাবী করে।
আওয়ামী লীগ বিএনপি-কে গণতান্ত্রিক হতে পারে না বলে মনে করে।	বিএনপি মনে করে আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্র একসাথে চলতে পারে না।
আওয়ামী লীগ মনে করে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জোট দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।	বিএনপি মনে করে আওয়ামী লীগ দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।
আওয়ামী লীগ নেতারা পারতপক্ষে বিএনপিকে এড়িয়ে চলেন।	বিএনপি নেতারা পারতপক্ষে আওয়ামী লীগকে এড়িয়ে চলেন।
দু'দলের শীর্ষ দুই নেত্রীর মধ্যে অকস্মাৎ দেখা হলেও কথা হয় না। একজন দক্ষিণমুখী আর একজন উত্তরমুখী। এ কারণেই এ দু দলের মাঝারি পর্যায়ের নেতারাও কোন সভায় হাসিমুখে বসলে তা পত্রিকার সচিত্র খবর হয়।	

বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রধানত উপরোল্লিখিত বিষয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক অবস্থানে থাকলেও অনেক বিষয়েই তাদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। এসব মিলের কিছু কিছু আশংকাজনক আবার কিছু কিছু মিল রহস্যজনক। আশংকাজনক মিলসমূহ ঃ

১. দু'দলই ক্ষমতায় থাকতে হরতালের বিরুদ্ধে জোড়ারো বক্তব্য রাখেন আর যখন বিরোধী দলে থাকেন তখন হরতালের সপক্ষে অবস্থান নেন।

২. দু'দলই পরস্পরকে স্বৈরাচারী বলে সম্বোধন করে, নিজের কৃতিত্ব নয়, অন্যের ব্যর্থতা প্রকাশ করে সন্তুষ্টি লাভ করে।

৩. দু'দলই নিজেকে পৃথিবীর সেরা দল এবং স্ব স্ব নেত্রীকে শ্রেষ্ঠতম নেত্রী বলে দাবি করে।

৪. দু'দলই গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কথা সব সময়ই বলে অথচ এ ব্যাপারে যা যা করা প্রয়োজন তা করে না বললেই চলে।

৫. দু'দলই পাল্লা দিয়ে পরস্পরের খারাপটা অনুসরণ করে ভালোটা পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে।

অপরদিকে বেশ কিছু জাতীয় মৌলিক বিষয়ে এই দুটি দল বিরোধী দলে থাকাকালে পূর্ণাঙ্গ প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে অথচ ক্ষমতায় এলে অন্য রকম অবস্থানে থাকে বা গড়িমসি করে। পর্যবেক্ষকদের মতে[২০] যে সব জাতীয় মৌলিক ইস্যু বিএনপি ও আওয়ামী লীগের আচরণে রহস্যজনক মিল লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হলো ঃ

১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
২. সংবিধানের সংযুক্ত ও কালা কানুনসমূহ বাতিল না করা;
৩. দলের সন্ত্রাসীদের লালন না করা;
৪. রাজনৈতিক কারণে মামলা দায়ের ও প্রত্যাহারের মহড়া;
৫. বেতার-টিভির স্বায়ত্ব শাসন না দেয়া;
৬. জাতীয় সংসদকে অকার্যকর করে রাখা;
৭. বিরোধী পক্ষের সাথে অসহনশীল আচরণ;

জাতীয় সংসদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যখন দেশের জন্য একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল তথা সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত আইন পাশ হয় তখন দেশের সংসদ সদস্য তথা রাজনীতিকদের মধ্যে সামাজিক অনুভূতি দেশপ্রেম তথা কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আবার এই সংসদ সদস্যরাই আবার যখন নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ ও লাভ সংক্রান্ত বিলে সম্মতি প্রদান করেন তখন তাদের মধ্যে স্বার্থপর অনুভূতি কাজ করতে দেখা যায়। আর স্বার্থপর অনুভূতি সব সময়ই যেহেতু এভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা যায় না তখন তা ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের অন্যান্য পন্থা যেমন বেআইনী পথে অর্থ উপার্জন অপরাধীদের সাহায্যে কাজ উদ্ধার তথা বিপক্ষ শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজ করা প্রভৃতির মধ্যে ঘুরপাক খায়। জাতীয় অনেক মৌলিক সমস্যা ঐকমত্যের অভাবে অমীমাংসিত থাকা সত্ত্বেও ঐকমত্য সৃষ্টির অনুশীলন বিস্ময়করভাবে এই প্রক্রিয়ার দুষ্টচক্রে বাধা পড়ে থাকে। বলা বাহুল্য এই পরিস্থিতি এ দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থনপুষ্ট বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফসল। আর এই বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী দল হচ্ছে দুটি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। সংসদীয় গণতন্ত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ব্যর্থতার দায়িত্ব এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উপর সাধারণভাবে এবং এই দুটি রাজনৈতিক দলের উপর বিশেষভাবে বর্তায়। এ দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি চরম অবিশ্বাস জনিত বৈরীভাব আর এ থেকে চলছে এক ধরনের অঘোষিত যুদ্ধাবস্থা।

বহুদল ভিত্তিক দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ঐকমত্যের অভাবের উদ্ভবঃ বিশেষজ্ঞদের মতে মূলত প্রতিটি দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতি রাজনৈতিক নেতাদের অগনতান্ত্রিক আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। যা প্রকারান্তরে জাতীয় পর্যায়ে মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ঐকমত্য সৃষ্টিতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯০ এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আপাতঃ সফল পরিসমাপ্তির পর ১৯৯১ সালের একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদীয় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দ্বিদলীয় সংসদীয় রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (এএল) এর প্রতি তৃণমূল পর্যায়ে ভোটারের সমর্থন দেখা যায়। সংসদেরও এই দুই দলের প্রতিনিধিরা সিংহভাগ আসনের অধিকারী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে তৃতীয় কোন রাজনৈতিক শক্তি অভ্যুদয় না ঘটা পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান দুই নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের দোর্দন্ড উপস্থিতি অব্যাহত থাকবে। অন্তত গত তিনটি নির্বাচনের ফলাফল সে ধারণারই ইঙ্গিত দেয়। এ ধরনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ধরনের স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ফলে এই আশা করা সঙ্গত যে, বাংলাদেশ ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যাবে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে পর্যবেক্ষক মহলে এ ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, এই দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঐকমত্যের অভাবজনিত এক সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। যা সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে।

দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিঃ সংসদে প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে সংলাপ বা কার্যকর দ্বিপক্ষীয় কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ উভয় দলেরই বাহ্যিক সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন মতের মুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে ঐকমত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে নিরুৎসাহিত করা হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণা নিবন্ধে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতির কারণে সাধারণ ও উপ-নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অনেক বিদ্রোহী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হয়।[২১] অনেক ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহী প্রার্থী বিজয়ী হয়। ফলে দল এক ধরনের Embarassing অবস্থার মধ্যে পড়ে। অপর একটি প্রতিবেদনে প্রধান একটি দলের অভ্যন্তরে পুরাতন নেতৃত্ব এবং নতুন নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দলের তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। (The Daily Star, June 7, 2003, p.1)। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অভ্যন্তরে এই বিভক্তি রাজনৈতিক আদর্শ কিংবা দলীয় রাজনীতি থেকে উদ্ভুত হয় নাই। এই সংঘাতের মূল কারণ ব্যক্তিগত লাভের আকাঙ্ক্ষা। দেশের প্রধান দলের এক নেতার মতে অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে মানুষ রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয় কিছু লোককে মন্ত্রী বানানোর জন্য, কিছু লোককে ব্যবসা দেওয়ার জন্য

এবং মহল বিশেষকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ব দেয়ার জন্য। দু দলের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা অনুপস্থিত। অপর পক্ষে দলের মূল নেতৃত্বই মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই এখতিয়ার অগণতান্ত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ। দলের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত প্রকাশের মাধ্যমে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন কার্যকর পরিস্থিতি না থাকায় ক্ষোভ ও প্রাধান্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে সংঘাতমূলক পরিস্থিতি বজায় থাকে। এই সংঘাতমূলক পরিস্থিতি রাজনীতিতে সন্ত্রাস প্রবণতার জন্ম দেয়। ফলে জাতীয় রাজনীতিতে এক দল যুবকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যারা স্থানীয়ভাবে মাস্তান' নামে পরিচিত পেশীশক্তি। সাধারণভাবে এদের সন্ত্রাসী হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের সব রাজনৈতিক দলেই কম বেশি এদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, যারা সচরাচর দেশ সেবার কথা বলেন, তাদের সবার সামনে প্রধানত দুটো প্রশ্ন থাকে একটা হল ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের স্বার্থে দেশের প্রয়োজনে কাজ করা আর অপরটি হল ব্যক্তি স্বার্থ বজায় রেখে দেশের প্রয়োজনের কথা বলে জনপ্রিয়তা অর্জনের দিকে অগ্রসর হওয়া। বাংলাদেশের রাজনীতির প্রায় সব পর্যবেক্ষকই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে এ দেশের দলীয় রাজনীতিবিদদের সকল কর্মকান্ডের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যে, কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে সরকারী ক্ষমতায় যেয়ে একদল যা খুশি তা-ই করার অধিকার লাভ করেন আর বিরোধী দলের কাজ হয় দেশে-বিদেশী এক চেটিয়া ভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বলা। সামরিক শাসন চলাকালে "সামরিক সরকারকে হেনস্তা করা তথা বিরোধীদের আন্দোলনে বিদেশীদের সমর্থন লাভের যে প্রচেষ্টা এদেশের তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে সেই ধারা, গণতন্ত্রায়নের পথ চলার সময়ও রাজনীতিবিদরা বহন করে চলেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর এই মনোভাব চূড়ান্ত ভাবে দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে "The Awami League and the Bangladesh Nationalist Party (BNP) are trapped in an enemy discourse". (S. Aminul Islam 2002 : 67)[২২]

নির্বাচনে ফলাফল সম্পর্কে ঐকমত্যের অভাবঃ পরপর তিনটি সফল সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন এ দেশে গণতন্ত্রের যাত্রাকে সুসংহত করে ছে বলে বিশেষজ্ঞগণ[২৩] অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে অনির্বাচিত সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিজয়ী এবং পরাজিত বড় দলগুলোর পরস্পর বিরোধী দাবী ঐকমত্যের অভাব জনিত সমস্যাকে প্রকটভাবে ফুটিয়ে

তুলেছে। সংসদকে নির্বাচিত করার সময়েই যে সংঘাতময় অবিশ্বাসের সুর শোনা যায় সংসদের র্কমকালে তা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে থাকে। পঞ্চম সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যদের একযোগে পদত্যাগ, ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শুধুমাত্র ৫ম জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক অংশগ্রহণ এবং সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্বকে দীর্ঘায়িত করেছে। অপরপক্ষে বিরোধী দল কর্তৃক "উদ্ভাবিত" তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল বিরোধীদল শূন্য সংসদে পাস হয়ে রাজনীতিতে ঐকমত্যের অভাবজনিত সমস্যার নতুন প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছে। আর এতকিছু সত্ত্বেও তত্তাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নির্বাচনে বিজয়ী এবং পরাজিত প্রধান পক্ষ ঐকমত্য পোষণ করা থেকে দূরে সরে আছে।

পরাজিত প্রধান প্রতিপক্ষ কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অনীহাজনিত প্রবণতার ধারাবাহিকতায় অষ্টম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্লেষকগণের মতে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল খুবই নাটকীয়। বিগত সরকারী দল আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে মাত্র এক পঞ্চমাংশ আসন লাভ করে আর বিএনপির নেতৃত্বে চার দলীয় ঐক্যজোট সংসদে দুই তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২০০১ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শতকরা ৪০.৪২ ভাগ ভোট পায় যা দলটি কর্তৃক ১৯৯৬ সালে প্রাপ্ত ভোট থেকে শতকরা ২.৬২ ভাগ বেশি। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শতকরা ৩৭.৪৭ ভাগ ভোট লাভ করেছিল। একটি শক্তিশালী দল হিসাবে ২০০১ সালের নির্বাচনী ফলাফলে আওয়ামী লীগ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে সাবেক শাসক দল বিএনপির ১৭ জন মন্ত্রী নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেছিলেন। সে নির্বাচনে বিএনপি ১২টি জেলায় কোন আসন পায়নি। আর ঢাকা মহানগরীর আট আসনের মধ্যে বিএনপি সাতটিতে কোন আসন পায় নি। অপরদিকে অক্টোবরের ২০০১ এর সাধারণ নির্বাচনে সাবেক শাসক দল আওয়ামী লীগের ২৮ জন মন্ত্রী পরাজয় বরণ করেছেন। উল্লেখ্য সাবেক সরকারী দল আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগরীর আটটি আসনের একটিও ২০০১ এর নির্বাচনে লাভ করতে পারেনি। তবে বিজয়ের এই প্রবল স্রোতের মধ্যেও বিএনপির সাতজন এমপি প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের মধ্যে একজনও জামানত হারায়নি।

১৯৯৯ এর ডিসেম্বর থেকেই তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত ও ইসলামী ঐক্যজোটের সহযোগিতায় শাসক আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি একটি

উপদল এই জোট থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু জাতীয় পার্টির অপর একটি উপদল নাজিউর রহমান মঞ্জুর এবং কাজী ফিরোজ রশিদের নেতৃত্বে আন্দোলনরত জোটে থেকে যায়। যদিও সরকার বিরোধী আন্দোলন তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি কিন্তু অক্টোবর ২০০১ এর নির্বাচনী দৌড়ে এই জোট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিয়াল্লিশটি আসন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের বিজয় বিঘ্নিত হয়নি। পর্যবেক্ষকদের মতে ২৬৯টি আসনে বিএনপি প্রার্থীরা জামাত-ই-ইসলামীর ভোট পেয়েছেন। ২৯৯টি নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা ২,২৩,২৬,৫২২ টি ভোট পেয়েছেন যা মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৯.৯৮%। বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ২,৫৯,৭৯,৬৭৮টি ভোট পেয়েছে যা মোট ভোটের ৪৬.৪৭%। এই সংখ্যক ভোটের মধ্যে জামাত-ই-ইসলামী প্রার্থীরা সরাসরি পেয়েছেন ২৩,৮৬,৯০৭ ভোট অর্থাৎ মোট প্রদত্ত ভোটের ৪.২৯%।

সারণী– ২

অক্টোবর ২০০১ এবং জুন ১৯৯৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনামূলক চিত্র ঃ

দল	অক্টোবর ২০০১				জুন ১৯৯৬				পার্থক্য	
	প্রাপ্তভোট	% শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন	% শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট	% শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন	% শতকরা হার	ভোটের পার্থক্য (%)	প্রাপ্ত আসনের পার্থক্য (%)
বিএনপি	২২৭১৭৫৪৮	৪০.৮৬	১৯১	৬৪.০৯	১৪২৫৫৯৮৬	৩৩.৬০	১১৬	৩৮.৬৭	+৭.২৬	+২৫.৪২
আ.লীগ	২২৩৬০১৯৪	৪০.২১	৬২	২০.৮১	১৫৮৮২৭৯২	৩৭.৪৪	১৪৬	৪৮.৬৭	+২.৭৭	-২৭.৮৬
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	৪০৩৭৯৯২	৭.২৬	১৪	৪.৭০	৬৯৫৪৯৮১	১৬.৪০	৩২	১০.৬৭	-৯.১৪	-৫.৯৭
জামাত	২৩৮৫৯০৭	৪.২৯	১৭	৫.৭০	৩৬৫৩০১৩	৮.৬১	৩	১.০০	-৪.২১	+৪.৭
জাতীয় পাটি (না-ফি)	৬২১৫১৫	১.১২	৪	১.৩৪	–	–	–	–	–	–
আইওজে	৩৭৫৯৮০	০.৬৮	২	০.৬৭	৪৬১৯৯৩	১.০৯	১	০.৩৩	-০.৪৭	+০.৩৪
স্বতন্ত্র	২০৮৬১৫১	৩.৭৫	৬	২.০২	৪৫০১৩২	১.০৬	১	০.৩৩	+২.৬৯	+০.৮৩
অন্যান্য	১০১৯৯৬১	১.৮৩	২	০.৬৭	৭৬৪৪৫২	১.৯০	১	০.৩৩	+০.০৭	+০.৩৪
মোট	৫৫৬০৫২২৪৮১০০			২৯৮	১০০		১০০	৩০০	১০০	

উৎস ঃ সাপ্তাহিক যায়যায় দিন, ভল্যুম ১৮, ইস্যু- ৩, অক্টোবর ২০০১, পৃষ্ঠা- ১২

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এককভাবে ২০০১ এর নির্বাচনে ১৯১টি আসন লাভ করে, যা মোট আসনের দুই তৃতীয়াংশ। চারদলীয় ঐক্যজোটের বাকী তিন শরীক দল ২৩টি আসন লাভ করে। চারদলীয় ঐক্যজোট কর্তৃক প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ২১৪। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পরপরই যথারীতি প্রধান পরাজিত পক্ষ কারচুরি অভিযোগ উত্থাপন করেন। এর পাশাপাশি এ অভিযোগও উত্থাপন হয় যে, বিজয়ী পক্ষ তাদের অসহিষ্ণু মনোভাব অতিরিক্তভাবে প্রদর্শন করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছেন এবং কেউ কেউ ক্ষমতায় থাকাকালে সাবেক শাসক দলের বাড়াবাড়িকে এরজন্য দায়ী করেছেন। এভাবে দেশে Tit for Tat বা ঢিল মারলে পাটকেলটি খেতে হয় রকমের খেলা চলছে। দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ পরিস্থিতিতে কোন মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় পড়েন। এ অবস্থার মধ্যে প্রধান বিরোধী দল বাদে অষ্টম জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ যথাসময়ে শপথ নেন। চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার গঠন করেন এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের একই মাসে প্রধান বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণ ২০০১ সালের ২৪ অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেন। আর নির্বাচনের নয় মাস পর ২৩ জুন ২০০২ তারিখে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদ অধিবেশনে যোগদান করেন। কিন্তু জাতীয় সংসদের কার্যক্রম ও পূর্ববর্তী ৫ম ও ৭ম সংসদের ভাগ্যবরণ করছে যাতে বিরোধী দল ও সরকারী দলের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে একটি অকার্যকর আইনসভার সৃষ্টি হয়েছে।

জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবঃ বাংলাদেশের চলমান গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ায় অনেক সাফল্যের পাশাপাশি এটা লক্ষ্যনীয় যে আইন সভার মাননীয় সদস্যগণ পারস্পরিক অবিশ্বাসের প্রচলিত ধারা বজায় রেখে চলেছেন। বিভিন্ন দলের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ তাঁদের সহকর্মী বিপক্ষ দলের সংসদ সদস্যদের সম্মান প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে তাঁদের অপরাগতার এই প্রবণতা দেখা যায়। এর পাশাপাশি আইন সভার কার্যক্রম চলার সময় সংসদের ভেতরে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পরপর সমাপ্ত পঞ্চম এবং সপ্তম উভয় জাতীয় সংসদের মেয়াদ কালে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ অব্যাহতভাবে এই প্রবণতা বজায় রেখে চলেছেন। এমনকি সচেতন উদ্যোগ সত্ত্বেও বর্তমান অষ্টম জাতীয় সংসদে ও তাঁরা অন্য দলের সহকর্মীদের প্রতি আস্থা ও সম্মান প্রদর্শনে অপারগতা প্রকাশ থেকে বেশি দূরে অবস্থান করেছেন না। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সম্প্রতি তাদের এক জরীপে দেখতে পেয়েছেন যে সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী সংসদ সদস্যগণ তাঁদের আলোচনার বেশির ভাগ সময় তাঁদের নেতাদের প্রশংসা অথবা বিরোধী নেতাদের সমালোচনার কাজে ব্যয় করেন। সংসদ সদস্যদের এই আচরণ পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস জন্ম দিতে সহায়ক। পর্যবেক্ষক মহল মনে

করেন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস দেশের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধানতম অন্তরায়। আর জাতীয় মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য না থাকার কারণে সংঘাতময় রাজনীতি সৃষ্টি হচ্ছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সংঘাতময় রাজনীতি দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের সমস্যাকে Political Difficulties হিসাবে আখ্যায়িত করে একে দেশের ব্যক্তিমালিকানায় বিনিয়োগের জন্য ক্ষতিকর এবং অগ্রগতিতে বাধাগ্রস্ত করছে বলে চিহ্নিত করেছে।

"পর্যবেক্ষকগণের মতে এমনকি এদেশে সুশীল সমাজও বিভক্ত। সুশীল সমাজের কেউ কেউ এদেশে খারাপ সব কিছুর জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করতে অভ্যস্ত, আবার কেউ কেউ বিএনপির নিন্দা করে চারদলীয় ঐক্যজোটের সরকারকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। আবার কারো মতে সকল আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান একমাত্র ধর্ম দিতে পারে। আর এভাবে জাতীয় মৌলিক ইস্যু সম্পর্কে কোনও ঐকমত্য পরিদৃষ্ট হয় না। সুশীল সমাজ সার্বিকভাবে তাই একে অপরের উপর দোষারোপের কাজে ব্যস্ত। বাংলাদেশের মত একটি স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ অপরিহার্য। সরকারের মধ্যের ব্যবধান অথবা সরকারী দল এবং বিরোধী দলের মধ্যের ঐকমত্যের অভাবে প্রচুর মূল্য দিতে হয় এবং স্পষ্টতঃই জনগণের কল্যাণ প্রয়াস অন্ধকারময় হয়ে উঠে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক শিষ্টাচারের সকল সীমা অতিক্রম করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মানেই চরম শত্রু বিবেচনা করা হয় যাদেরকে নিশ্চিহ্ন করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে। এখানে সচরাচর অসহনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রতিপক্ষের একে অপরের প্রথম সুযোগেই কঠিন আঘাত করার মধ্য দিয়ে।

জাতীয় সংসদে কোরাম সংকট, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব তথা সংসদ কর্যক্রমের প্রতি সংসদ সদস্যদের অনাগ্রহের অন্যতম একটি সূচক। তা ছাড়া কোরাম সংকট জাতীয় সংসদকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে দুই পক্ষের সদস্যদের আন্তরিকতার অভাবে বহিঃপ্রকাশ। অথচ কোরাম সংকটের কারণে বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিশাল অংকের অর্থের অপচয় হচ্ছে। Transparency International Bangladesh (TIB) ২ মে ২০০৩ জাতীয় সংসদ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় জাতীয় সংসদে কোরাম সংকটের কারণে কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। অষ্টম জাতীয় সংসদের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে কোরাম সংকটের কারণে ২ কোটি ৩৫ লাখ, (দুইকোটি পয়ত্রিশ লাখ) টাকা গচ্চা দিয়েছে। সংসদ অধিবেশন পরিচালনায় প্রতি মিনিটে খরচ হয় ১৫ হাজার টাকা। সে অনুযায়ী তিনটি অধিবেশনে ব্যয় হয়েছে ১১,৪৮,৩৯,২৫০ টাকা। এই অধিবেশন গুলোতে কোরামের অভাবে মোট নষ্ট হয়েছে ১৫৬৯ মিনিট।

এর মধ্যে	চতুর্থ অধিবশেনে ১৯২ মিনিট, @ ১৫০০০- প্রতি মিনিট	=	২৮,৮০,০০০-
	পঞ্চম অধিববেশনে ১৬৭ মিনিট @ ১৫০০০-প্রতিমিনিট	=	২৫,০৫,০০০-
	ষষ্ঠ অধিবেশনে ২১০ মিনিট @ ১৫০০০- প্রতিমিনিট	=	১,৮১,৫০,০০০-
		=	২,৩৫,৩৫,০০০-

একটি দরিদ্র দেশের কষ্টার্জিত অর্থ রাষ্ট্রের 'সচেতন' কর্ণধারদের দ্বারা এভাবে ধ্বংস হওয়া সম্রাট জুলিয়াস সীজারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "জীবনের নগন্য আমোদ-ফূর্তি উপভোগ করার জন্য জুলিয়াস সীজার তার দেশের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছিলেন"।

সব দলের সংসদ সদস্যদের পার্লামেন্টের অধিবেশনে সময়মত অংশগ্রহণের আগ্রহ না থাকার ফলে একদিকে যেমন কোরাম সংকট হচ্ছে এর পাশাপাশি বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ অধিবেশন বয়কটের সমস্যা গণতন্ত্রের এই অন্যতম প্রতিষ্ঠানটিকে অকার্যকর করে তুলেছে। ফলে "বাংলাদেশের পার্লামেন্ট সরকারের জবাবদিহিতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি।"[২২]

উপসংহারের দ্বারপ্রান্তেঃ বাংলাদেশের সব সময়েই কম বেশি সংকট চলেছে। তবে এর মধ্যে কোনও কোনও সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা গেছে। এসব সংকট দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা স্থায়ী হতে পারেনি ঐকমত্যের অভাবে। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যাবলী সম্পর্কে জাতীয় ঐকমত্য না থাকায় তা সমাধানের কোনও সিরিয়াস এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অনুপস্থিত থেকেছে ফলে পরস্পর সম্পর্কিত সমস্যাগুলো ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করেছে। ১৯৯০ এর গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা এ ক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু পরপর তিনটি সংসদীয় নির্বাচন সফল ভাবে সম্পন্ন হবার পরও জাতীয় মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

'ঐকমত্য' অনুপস্থিত থাকা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণে রাজনৈতিক দলগুলোর অক্ষমতার ফলশ্রুতি। এই অক্ষমতার সূচনা হয় রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুশীলনের অভাব থেকে। রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত মূল নেতৃত্বের ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুযায়ী গৃহীত হবার প্রবনতা জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সংক্রমিত করে। "সম্মতি ও 'বিতর্ক' পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া একটি অভ্যাসের বিষয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুক্ত ভাবে এই প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত না হবার কারণে এবং মূলনেতৃত্বের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সমুন্নত রাখতে অভ্যস্ত হবার কারণে আইন সভায় জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে 'ঐকমত্যের' ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে না।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য এবং পারস্পরিক আস্থাহীনতা তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে ৫ম, ৭ম, এবং অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রধান পরাজিত দল কর্তৃক তথাকথিত কারচুপির অভিযোগ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে,

বিজয়ী দলকে পরাজিত দল কর্তৃক অভিনন্দন না জানানোর মধ্যে দিয়ে, বিজয়ী দলের কোনও মহল কর্তৃক বাড়াবাড়ি আচরণের মধ্য দিয়ে, এই তিনটি সংসদের জীবদ্দশায় প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে সংসদ বয়কট করার মধ্য দিয়ে পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের জীবদ্দশায় প্রধান বিরোধী দল এবং সরকারী দলের মধ্যে সমঝোতা হওয়া সত্ত্বেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ার মধ্য দিয়ে, সংসদের বেশির ভাগ আলোচনা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আবর্তিত হওয়ার মধ্য দিয়ে, সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু কোনও তরফ থেকেই পরস্পরের মত পার্থক্য দূরীকরণের উদ্যোগ সফল না হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং সর্বোপরি ঐকমত্য ও আস্থা সৃষ্টির জন্য দায়িত্বশীল রাজনৈতিক মহল থেকে কোনও উদ্যোগ না নেয়ার মধ্য দিয়ে।

জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধীয় বৃহৎ ইস্যুগুলো যেমন পার্লামেন্টকে কার্যকর করা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি "সম্মতি ও বিতর্কের" মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি অবলম্বনের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যে পৌছাতে আপাতত না পারলেও ছোট ও অবিতর্কিত বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হতে কোন বাধা থাকার কথা নয়। কারণ এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্র আছে। যেমন, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং রোগ শোকের নির্মম কাষাঘাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অন্য যে কোন সংঘাতের চেয়ে জরুরী এবং নিশ্চিতভাবে অবিতর্কিত। লক্ষ লক্ষ্য বাংলাদেশী প্রাণকে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য রাজনীতিবিদদের ব্যক্তিস্বার্থোদ্ধারের পথ পরিহার করে রাষ্ট্রনায়ক (STATESMAN) সুলভ মনোভাবের পরিচয় দেয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে।

ঐকমত্যের ধারণা অনুযায়ী কোনও অযৌক্তিক বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হওয়া আকাঙ্ক্ষিত নয়। যে সব বিষয় যুক্তিসঙ্গত এবং যে সব মত 'বাস্তব কারণসমূহের মুক্ত অনুশীলনের প্রকৃতির ফল' (The Natural consequence of the free exercise of practical reasons) শুধুমাত্র সেগুলোকে পরস্পর কর্তৃক গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ঐকমত্য হতে পারে। ১৯৯০ এর নভেম্বর মাসে তিন দলীয় ঐক্যজোট কর্তৃক স্বাক্ষরিত যৌথ ঘোষণা বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের একটি দলিল। এ দলিলে রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছেছেন এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন। দেশের জনগণের আশা এটাই যে রাজনৈতিক দলগুলো এ অঙ্গীকার সমুন্নত রাখবেন ও বাস্তবায়ন করবেন। আর এ ক্ষেত্রে বাস্তব কারণসমূহের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব অপরিহার্যভাবেই করবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান সংঘাতময় রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করে, বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে দ্বিধাহীন যে ঐকমত্যের রাজনীতিই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ অভিমত পোষণ করেন যে, এই ঐকমত্য গড়ে উঠতে পারে সংবিধানের মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে যেখানে গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং মৌলিক প্রয়োজন সমূহ মিটানোর অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. তাঁর সদ্য সমাপ্ত পিএইচডি, থিসিসে বর্তমান গবেষক বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথে ৩৫টি প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করেছেন। জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ঐকমত্যের অভাব অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা। দেখুন Arun Kumar Goswami, "Institutionalization Constraints of Democracy in Bangladesh (1990-1996)" অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

২. দেশের শীর্ষ স্থানীয় থিংক ট্যাংক Centre for Policy Dialogue (CPD), ইংরেজি দৈনিক এবং বাংলা দৈনিক প্রথম আলো গত ৩ থেকে ৫ জুন ২০০৩ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সংঘাত মূলক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করে। দেখুন প্রথম আলো ৬ জুন ২০০৩। আর ও দেখুন বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, 'বর্বরতা বেড়ে চলেছে', যুগান্তর ৫ জুলাই ২০০৩ পৃ. ৫।

৩. দেখুন Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtue and the Creation of Prosperity,* Penguin, London, 1996

৪. 'বৃটিশ সংবিধান সম্পর্কে জেনিংস এর মন্তব্য ঃ "The institution necessary for the multifarious functions of the modern state have been established from time to time as the need arose." বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উদ্ভব সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য হতে পারে। দেখুন Ivor W. Jennings. *The Law and the Constitution,* Kent University of London Press. 1949. 3rd Edition.

৫. দেখুন Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man,* Penguin Books, England, 1993

৬. দেখুন Robert Putnam, *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy.*

৭. দেখুন Dankwart W. Rustow (1970) "Transition to Demorcray: Toward a dynamic model" in *Comparative Politics* 8,2 : 337-64.

৮. দেখুন Dankwart Rustow এর মতে গণতন্ত্রের সফলতার চারটি পূর্বশর্ত হচ্ছে (১) জাতীয় ঐকমত্য, (২) দীর্ঘস্থায়ী ও অব্যাহত দ্বন্দ্ব, (৩) গণতান্ত্রিক রীতি নীতির সচেতন অনুসরণ, (৪) নির্বাচন জনগোষ্ঠী ও নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহাবস্থান (Habituation).

৯. দেখুন J.P. Nettl. *Political Mobilization, A Sociological Analysis of Methods and concepts,* Basic Books. Inc. Publisher, New York, 1967, PP. 334-335.

১০. দেখুন Barry Holden, *The Nature of Democracy*, Thomas Nelson and Sons Ltd. London, 1974. P. 188

১১. দেখুন Ilter Turan, "The Democratic anomalies, Why some countries that have passed Vanhanen's democratic threshold are not democracies", in Tatu Vanhanen, *Prospects of Democracy, a study of 172 Countries*, Routledge, London and New Your, 1997, PP. 284-299.

১২. দেখুন Robert Putnam (1993a). *op* cit.

১৩. দেখুন Kim and Kang (eds) *Korea: A Nation in Transition,* RCPU, (Seoul, 1978, P. 178.

১৪. দেখুন John Rawls, "The domain of the political and overlapping consensus", in Dabid Coop, Jean Hampton, and Johan E. Roemer (eds) (*The idea of democracy*, Cambridge University Press, UK. 1999 PP. 245-269.

১৫. দেখুন Ellis S. Krauss, "Politics and the Policy Making Process," in Takeshi Ishida and Ellis S. Krauss (eds), *Democracy in Japan*, University of Pitts burgh Press, London, 1989, PP 39-66 (52)

১৬. দেখুন A.H. Birch, *Representative and Responsible Government,* Allen & Unwin, London. 1964.

১৭. দেখুন Richard Sission, "Culture and Democratization in India", in Larry Diamond (ed), *Political Culture and Democracy in Developing Countries*, Textbook Edition, Lynne, Rienner Publishers, Roulder, London, 1994, PP. 29-58.

১৮. দেখুন Thomas W. Smith, "Aristotle on the conditions for and limits of the Common Good", *American Political Science Review,* Vol. 93, No. 3, September 1999 PP. 625-636 (628)

১৯. Internet থেকে সংগৃহীত।

২০. দেখুন সাপ্তাহিক *এখন*, ০৬-১২ জুলাই, ২০০৩ পৃঃ ৯-১৩।

২১. Arun Kumar Goswami, "Rajshahi-5 Parliamentary by- election : An Analysis", in *Perspective in Social Science,* Vol. 7 June 2001, PP. 123-157, Centre for Advanced Research in Social Science, University of Dhaka.

২২. S. Aminul Islam, "Political Parties and future of Democracy", in A.M. Chowdhury and Fakrul Alam (eds), *Bangladesh on the threashold of the Twenty-First Century,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka. 2002 PP. 61-70 (67)

২৩. Rounaq Jahan "Political Development", in A.M. Chowdhury and Fakrul Alam (eds) *Bangladesh in the threshold of the Twenty First Century,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka 2002, PP. 43-60 (58)

২৪. ফয়েজ আহমেদ, "বাজেট নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল, মানব-বিনাশী যন্ত্রণার উৎস," *আজকের কাগজ,* ১৬ জুন ২০০৩ পৃঃ ৬।